সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৮ ॥ সংখ্যা : ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪২৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সফিউদ্দীন আহমেদের ছাপচিত্র : নিরীক্ষা ও নন্দনের সম্মিলন

মো. বনি আদম*

সারসংক্ষেপ: সফিউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রকলার জনক বা পুরোধা ব্যক্তি। ছাপচিত্রকলার সকল মাধ্যমে তাঁর অবাধ বিচরণ। ড্রইংয়ের বলিষ্ঠতা আর তেলরং চিত্রে তাঁর সৃজনশীলতার প্রাণশক্তি অনুভব করা যায়। জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে সমৃদ্ধ তাঁর চিত্রসম্ভার। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্যের প্রতিফলন তাঁর চিত্রসমূহে। আঙ্গিক আর মাধ্যমের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পী ব্যাপৃত থেকেছেন সারাটা জীবন। তাঁর নিরীক্ষার শুরু বিগত শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতা পর্বে উড-এনগ্রেভিংয়ের মধ্য দিয়ে আর পূর্ণতা পায় লন্ডনপর্বে কপার এনগ্রেভিংয়ের গীতল রেখার উৎকর্ষ সাধনে – যা তাঁকে দিয়েছে অনন্যতা। বিষয়বৈচিত্র্য, শিল্পকুশলতা আর নৈপুণ্যে ভরা সফিউদ্দীনের শিল্পভাণ্ডার। এ প্রবন্ধে সফিউদ্দীন আহমেদের ছাপচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সফিউদ্দীন আহমেদ – শিল্পচর্চা যাঁর কাছে ছিল নিরন্তর সাধনার বিষয়। ফলে তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মে লক্ষ করা যায় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, একাগ্রতা বা অভিনিবেশের ছোঁয়া। ছাপচিত্রের প্রায় সকল মাধ্যমে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সর্বদা নিরীক্ষাপ্রবণ এ শিল্পীর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পকর্ম যেন অভিন্ন সত্তা। তাঁর চিত্রের জমিনে সর্বদা প্রশান্তির পরশ অনুভব করা যায়। নিরীক্ষা ও নন্দনের সম্মিলনে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য শিল্পকর্মসমূহ।

সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পযাত্রা

কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের শিল্পশিক্ষা থেকে লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফ্টস পর্যন্ত দীর্ঘ পরিসর সফিউদ্দীন আহমেদের একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের কালপর্ব। এ সময় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রতিনিয়ত ছাড়িয়ে গেছেন নিজেকে। আধুনিক শিল্পের নানা মাধ্যম আত্মস্থ করেছেন নিবিড় নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় এবং সারাটা জীবন ব্যাপৃত থেকেছেন শিল্পসাধনায়।

সফিউদ্দীন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালের ২৩ জুন কলকাতার ভবানীপুরে। বেড়ে ওঠেন এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-নিবিষ্ট পারিবারিক পরিবেশে, ফলে তাঁর মন ও মননে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ তৈরি হয়।

সফিউদ্দীন ১৯৩৬ সালে ভর্তি হন কলকাতা সরকারি আর্টস্কুলে। প্রথমে ড্রাফ্টস্ম্যানশিপে এবং পরবর্তীকালে ফাইন আর্টে। ১৯৩৬-৪২ – এ কালপর্বে সম্পন্ন

---

* অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.6

করেন ছয় বছরের স্নাতক সম্মান কোর্স এবং ১৯৪৪-৪৬ – এ সময়ে কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন শিক্ষকতার কোর্স। ১৯৪৬ সালেই নিযুক্ত হন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষকতায়। শিক্ষকতার কোর্সে সফিউদ্দীনের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ছাপচিত্র। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৩)

সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পসত্তার বিকাশে অবদান রয়েছে বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর শিল্পীব্যক্তিত্বের, যাঁদের তিনি স্মরণ করেছেন গভীর কৃতজ্ঞচিত্তে, এঁরা হলেন: মুকুলে দে (১৮৯৫-১৯৯১), বসন্তকুমার গাঙ্গুলি (১৮৯৩-১৯৬৮), অতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭), মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৬৮), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-১৫৫), প্রহ্লাদ কর্মকার, ঋষেণ মিত্র, আবদুল মঈন (১৯১০-১৯৩৯) প্রমুখ।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৩) এসমস্ত শিল্পীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা শিল্পী সফিউদ্দীনকে শিল্পের প্রতি আরো বেশি অনুরক্ত করে তোলে, বিশেষ করে ছাপচিত্রের সূক্ষ্ম-রেখার কারিকুরিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন প্রবলভাবে। 'মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পী ভারতের ছাপচিত্রকে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে যে উন্নত শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন, তা সফিউদ্দীন আহমেদকে আকৃষ্ট করে। তিনিও এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণসহ তাঁর শিক্ষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ছাপচিত্রকে পৌঁছে দেন শিল্পের উন্নত মহিমায়। ফলে সমগ্র ভারতের আধুনিক ছাপচিত্রের অগ্রণী শিল্পীদের তালিকায় তাঁর নাম অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৪)।

ছাত্র জীবনেই অখণ্ড বাংলার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সফিউদ্দীনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'বেঙ্গল পেইন্টার্স টেস্টিমনি' শীর্ষক ছবির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। এ প্রকাশনায় চারজন সম্পাদকের মধ্যে সফিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন অন্যতম। 'তাঁর শিল্পবোধ গঠনে এসব সম্পর্কের রয়েছে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৫)।

চল্লিশের দশকেই শিল্পী সফিউদ্দীন সর্বভারতীয় পর্যায়ে একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর অনন্য শিল্প প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন; এর মধ্যে ১৯৪৫-৪৭ পর্বেই চারটি পুরস্কার লাভ করেন। এ পুরস্কারগুলো হলো: কলকাতার অ্যাকাডেমিক অফ ফাইন আর্ট প্রদত্ত 'অ্যাকাডেমিক প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক' (১৯৪৫), নয়দিল্লিতে দ্য অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট্স সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সমকালীন চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার (১৯৪৬), ওই একই প্রতিষ্ঠান আয়োজিত আন্তঃএশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার (১৯৪৭) এবং পাটনা শিল্পকলা পরিষদ প্রদত্ত 'দ্বারভাঙ্গা মহারাজার স্বর্ণপদক' (১৯৪৭)। পরপর দুইবার পুরস্কার প্রাপ্তির স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী সফিউদ্দীনকে 'দ্যা অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট্স সোসাইটি'র সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৫; আল্ভী, ২০১২: ১৯)।

১৯৪৬-৪৮ কালপর্বে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী, ১৯৪৬-এ প্যারিসের মর্ডান আর্ট মিউজিয়ামে ইউনেস্কো আয়োজিত প্রদর্শনীতে ভারতের প্রথিতযশা শিল্পীদের সাথে তাঁর ছবিও নির্বাচিত হয়। বিশ্বের ৪৪টি দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন এ প্রদর্শনীতে। পিকাসো, ব্রাক, মাতিস, শাগালের মতো শিল্পীদের সাথে তাঁরও ৩টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এ শুধু ব্যক্তি সফিউদ্দীনের নয়, যা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পকলার জন্য এক বিরল সম্মান। (মাহমুদ, ২০০২: ৩৫) এসমস্ত সম্মান শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদেক সর্বভারতীয় পর্যায়ে মর্যদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের পূর্বেই সফিউদ্দীন আহমদ প্রতিভাধর শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যান কিন্তু ভারত-বিভক্তির ফলে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের সকল মুসলিম শিক্ষক পূর্ববাংলায় চলে আসেন। ফলে ঢাকায় এসে সফিউদ্দীন আহমেদকে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। (শোভন, ২০০৭: ৩০২)।

ঢাকায় চারুকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়তে জয়নুলের সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সফিউদ্দীন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার জীবন শুরু করলেও ১৯৪৮ সালে ঢাকা সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউটে ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। শুধু আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় নয় এদেশে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন সর্বদা। 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে চারুশিল্পের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৯)

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ ছাপচিত্রে উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯৫৬ সালে লন্ডন গমন করেন। সেখানে সেন্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস থেকে এচিং ও এনগ্রেভিংয়ে ডিস্টিংশনসহ ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন, তবে এ ডিগ্রি প্রাপ্তির পরও আরো একবছর উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। লন্ডন স্কুলে সফিউদ্দীনের শিক্ষক ছিলেন মেলুয়িন ইভানস – যিনি ছিলেন আধুনিক ছাপচিত্রের জনক স্ট্যানলি হেটারের বন্ধু। 'এচিং-অ্যাকুয়াটিন্ট-এনগ্রেভিংয়ের কঠিন টেকনিক-নির্ভর শিল্পমাধ্যমে হেটার নিয়ে এসেছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোময় রেখার বিন্যাস যা ইতিপূর্বে সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়নি। টেকনিক বা শৈলীর কুশলতা ও পরিশীলনের প্রতি আজীবন আগ্রহী সফিউদ্দীনকে ছাপাইছবিতে রেখার এ বেগবান প্রকাশময়তা ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল...'। (আবুল মনসুর, ২০১৬: ৪২২) লন্ডনের শিল্পশিক্ষা, শিক্ষক শিল্পসমালোচকদের সান্নিধ্য ও প্রশংসা এবং এ সময়ে ইয়োরোপের নানা শিল্পগ্যালারি পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, ফলে সফিউদ্দীনের মনে নতুন শিল্পবোধের সঞ্চারণ লক্ষ করা যায়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১২: ৯০)।

লন্ডনের শিল্পশিক্ষা সম্পন্ন করে শিল্পী দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৯ সালে। (রফিকুন, ২০১২: ৫৭) সঙ্গে নিয়ে আসেন নানা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শিল্পকুশলতা আর নৈপুণ্যেভরা শিল্পীসত্তা। দেশে ফিরে ছাপচিত্রের নানা-পরীক্ষার ব্যাপৃত হন, রূপান্তর ঘটে তাঁর চিত্রের ভাষায়। এ পর্যায়ে ১৯৬৩ সালে চারুকলায় অবদানের জন্য তিনি পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত 'প্রেডিডেন্ট পদক' লাভ করেন। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৯)।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পী ঢাকায় তাঁর স্বামীবাগের বাড়িতেই ছিলেন এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায়, প্রত্যক্ষ করেন বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, যার প্রভাব পড়ে তাঁর শিল্পকর্মে। ১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন প্রবলভাবে – যেন নতুন প্রাণ, নতুন গতি সঞ্চারিত হয় তাঁর শিল্পকর্মে, এবং এ গতি অব্যাহত থাকে তাঁর বার্ধক্য অবধি। পরম সাধনায় শিল্পী বাংলদেশের চিত্রশিল্প তথা ছাপচিত্র মাধ্যমের শিল্পকে পৌঁছে দেন অনন্যমাত্রায়।

শিল্পভাবনা

সফিউদ্দীন আহমেদ – আপাদমস্তক এক শুদ্ধাচারী শিল্পীর নাম। তাঁর চিত্র করণকৌশলগত নিপুণতা, আঙ্গিক নির্মাণে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিষয়বৈভবে প্রাণপ্রাচুর্য এবং পরিশীলিত, সৃজনশীল মনের আবেগ-অনুভূতি আর নান্দনিকবোধের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। প্রতিনিয়ত এক অতৃপ্তিবোধ তাড়া করে ফিরেছে শিল্পীকে জীবনভর। ফলে তাঁর শিল্পসম্ভার বৈচিত্র্যেভরা, রূপমাধুর্যের এক অপার ভান্ডার।

সফিউদ্দীন আহমেদ প্রায়ই বলতেন 'আমার সবচেয়ে ভালো ছবি আমি এখনো আঁকতে পারিনি' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১১)। তাঁর এ অতৃপ্তি প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক (২০১২: ৮৮) বলেন:

> এই অতৃপ্তি একজন মহৎ শিল্পীরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ছবি এঁকে তাঁর কখনো মনে হয়নি যে, তিনি ভালো কিছু এঁকে ফেলেছেন। এরকম অপূর্ণতা নিয়েই সবসময় কাজ করার ফলে এক জায়গায় তিনি আটকে থাকেননি। পরিণামে রেখাচিত্র, ছাপচিত্র, তেলচিত্র – এই তিন মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছেন এক শিখরস্পর্শী কৃতিত্ব। ব্যক্তিজীবনের মহৎ ভাবনাও তাঁর শিল্পবোধকে সর্বদা সজীব ও সমৃদ্ধ করেছে। আর্থিক উন্নতির চেয়ে তিনি সব সময়ই চেয়েছেন আত্মিক উন্নতিসহ শিল্পের উন্নতি ঘটাতে। সেজন্য সবসময় যুগের পরিবর্তনের ধারাকে নিজ চিত্রে অঙ্গীকার করারও চেষ্টা করেছেন। সব সময়ই চেষ্টা করেছেন চিত্রের জমিনে নতুন কিছু যোগ করার। মূলত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই আয়ত্ত করতে চেয়েছেন যুগের পরিবর্তনশীলতার দাবি। স্বল্পভাষী, কোমল স্বভাবের অধিকারী এই শিল্পীর মনে সর্বদাই ছিল এক গভীর প্রশান্তির ভাব, যা তাঁর চিত্রের জমিনকেও দিয়েছে অসামান্য প্রশান্তির ব্যঞ্জনা।

শিল্পী সফিউদ্দীনের শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি আরো বলেন: 'An especially noticeable aspect of Safiuddin Ahmed's work is the variety of themes, grounded in what his country has offered him. On this basis, his canvas has always depicted social realism and his yearning to touch the very soul of the land has been pronounced.' (Syed Azizul, 2011: 31). সফিউদ্দীনের চিত্রের জগৎ নির্মিত হয়েছে তাঁর চিরচেনা পরিবেশ থেকে, জীবন চলার বাঁকে বাঁকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটেছে তাঁর চিত্রের মাঝে। কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তাঁর চিত্রের জমিন ভরে উঠেছে দুমকার মেঠোপথ, শালবনের সারি, ময়ূরাক্ষীর স্নিগ্ধতা, সাওতাল রমণীদের দেহবল্লরীসহ তাদের জীবন-জীবিকা-নিত্যদিনের সহজ-সরল রূপকল্পে। শিল্পসমালোচক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সফিউদ্দীনের প্রথম পর্বের শিল্পকর্ম নিয়ে বলেন – 'তার প্রথম পর্যায়ের ছবিতে উন্মীলিত হয়েছে গ্রামীণ শান্ত জীবন। ঐ জীবন নিটোল, মসৃণ, কবিতা-রঙ্গীন।' (বোরহানউদ্দিন, ১৯৭৪: ৪৭) শিল্পীর চিত্রকর্ম এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে এসে নতুন আবাস গড়া, সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয় তাঁর জীবন। ফলে চিত্রের ভাষাতেও পরিবর্তন আসে। নদীমেখলা পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের জীবন-জীবিকা আর মানুষের অন্তরের সুরের অনুরণন অনুভব করা যায় তাঁর চিত্রে, নদী-নৌকা, জাল-জেলে, মাছ, বন্যায় প্লাবিত বাংলার রূপ। সর্বোপরি বাংলার প্রকৃতি ও শ্রমজীবী মানুষের কর্মকোলাহলে মুখর তাঁর চিত্রের জমিন।

১৯৫৬ সালে লন্ডন যাওয়ার পূর্বপর্যন্ত সফিউদ্দীনের চিত্রকলা ছিল মূলত অবয়বধর্মী, চেনা-জানা প্রকৃতি-পরিবেশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু লন্ডন যাওয়ার পর তাঁর চিত্রে ভাঙা-গড়ার খেলা চলতে থাকে, ফলে পরিচিত জগৎ যেন পুরোপুরি হারিয়ে যায় এবং তাঁর চিত্রতলে ভিড় করে নানা অপরিচিত অবয়ব অর্থাৎ এ সময় তাঁর চিত্রের ভাষা হয়ে ওঠে ইমেজ প্রধান; অনেক বেশি করণকৌশলনির্ভর। চিত্রের আঙ্গিক নির্মাণে নানা-পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন তিনি। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন:

> আমার মধ্যে সবসময় যে অতৃপ্তিটা কাজ করে তা সুন্দরের জন্য। আবার একই সঙ্গে তা উন্নত একটা টেকনিকের জন্যও। টেকনিক্যাল সাইডটাকে নিখুঁত করার দিকেই আমার ঝোঁক। টেকনিককে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করাই আসল কথা। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ২৫)

সফিউদ্দীনের কাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঠাসা, টেকনিক বা করণকৌশলের প্রয়োগ থাকলেও তা টেকনিকসর্বস্ব নয়। তাঁর চিত্রের ভাষা অনেক বেশি সংবেদনশীল ও সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ।

সফিউদ্দীন আহমদ শুধু ছাপচিত্রেরই নয়, রেখাচিত্র আর তেলচিত্রও সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এক মাধ্যমের নানা বৈশিষ্ট্যকে অন্য মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্ট করতেন। যেমন ছাপচিত্রের নানা মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্য তেলচিত্রে সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন। তেমনি তেলচিত্রের বুনটের বৈশিষ্ট্যকে ছাপচিত্র-তলে প্রয়োগ করে এ মাধ্যমে বৈচিত্র্য এনেছেন। আবার একটি ছবিতে কাজ করতে গিয়ে নতুন কোনো ইফেক্ট বা রূপের সন্ধান পেলে তিনি অন্য ছবিতেও প্রয়োগ করতেন। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন:

> এক ছবি থেকে কিছু আবিষ্কার করলে পরবর্তী ছবিতে তার ব্যবহার করা এবং তার ফলাফল দেখে আবার কিছু পেলে পুনরায় আরেকটিতে তার ব্যবহার করা, এভাবে দেখতে দেখতে খুঁজতে খুঁজতে চলাতেই আনন্দ। নতুন কিছু পাওয়ার আশায় যে এগিয়ে যাওয়া, সেটিই তো আসলে শিল্পীদের অনুপ্রেরণা। এটিই আসল। শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিল্পীর এ কথাটি হয়তো অত্যন্ত সত্যি। নতুন কিছু সৃষ্টি আর পাওয়ার আশাটি মরীচিকার মতো আকর্ষণ করে বলেই শিল্পীরা একের পর এক ক্যানভাস সাজিয়ে তোলেন। (রফিকুন, ২০১৬: ৯৮)

এভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পী সফিউদ্দীন খুঁজে পেয়েছেন নিজস্ব এক শিল্পভাষা, যা তাঁকে দিয়েছে বিশিষ্টতা।

সফিউদ্দীন আহমেদের উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্র

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ চিত্র রচনা করেছেন নানা মাধ্যমে – তেলচিত্র, জলরং চিত্র, রেখাচিত্র ও ছাপচিত্র সকল মাধ্যমেই তাঁর সমান দক্ষতা। তবে ছাপচিত্রের ছাত্র হওয়ায় ছাপচিত্রের নানা মাধ্যম নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছেন জীবনভর। উড-এনগ্রেভিং, ড্রাইপয়েন্ট, লিথোগ্রাফি, এচিং, অ্যাকুয়াটিট, মেটাল-এনগ্রেভিং প্রভৃতি মাধ্যমের ছাপচিত্রসমূহ তাঁর চিত্রকলার জগৎকে করেছে সমৃদ্ধ।

সফিউদ্দীন আহমেদের ছাপচিত্র রচনার শুরুটা ছিল উড-এনগ্রেভিংয়ের সূক্ষ্মরেখার কারুকাজ দিয়ে সেই চল্লিশের দশকে কলকাতা পর্বে। উড-এনগ্রেভিংয়ের করণকৌশলগত দিকেই ছিল তাঁর বেশি আগ্রহ, ফলে এ মাধ্যমে তিনি অসাধারণ কিছু ছাপচিত্র নির্মাণ করেন ।

উড-এনগ্রেভিং চিত্র

উড-এনগ্রেভিং মূলত রিলিফ পদ্ধতির একটি মাধ্যম। এ মাধ্যমটিতে সাধারণত ক্রস সেকশনে কাটা নরম কাঠের সমতল অংশ নরুন, ব্যুরিন ইত্যাদি নানা খোদাইযন্ত্রের সাহায্যে খোদাইয়ের মাধ্যমে উঁচু ব্লক তৈরি করে ছাপ নেওয়ার পদ্ধতি। (শোভন, ২০১৬: ৪২; Basupurna, 2011: 6) এ পদ্ধতিতে কাঠের বুক চিরে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার সমন্বয়ে আলো-আঁধারী মায়াজালে দৃষ্টিনন্দন ছাপচিত্র নির্মাণ করা যায়। সফিউদ্দীন আহমেদের উড-

এনগ্রেভিংয়ের সূচনাপর্বে রচিত ছাপচিত্রকলার নিদর্শন হলো 'বিহারের দৃশ্য' (১৯৪০), তবে এ চিত্রটিতে সফিউদ্দীনের শিক্ষানবিশকালের বিষয়টি স্পষ্ট। পরবর্তীকালে আঁকেন 'বাঁকুড়ার দৃশ্য' (১৯৪২), 'সাওতাল রমণী ও শিশু' (১৯৪২), 'কৃষকের মুখ' (১৯৪২)।

কৃষকের মুখ

উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটি যেন কৃষকের জীবন-সংগ্রামের চালচিত্র, চিত্রটির কেন্দ্রভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে কৃষকের আবক্ষ অবয়ব। চিত্রের পশ্চাৎভূমিতে রয়েছে কৃষকের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড বা ফসল ফলানো থেকে ফসল সংগ্রহের যে ধারাবহিক প্রক্রিয়া তার সুস্পষ্ট বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। চিত্রের ডান দিক থেকে শুরু হয়েছে এর ধারাবাহিকতা – প্রথমে রয়েছে কৃষকের হালচাষের দৃশ্য, তারপর ফসল বোনা, ফসল কাটা, গরুর গাড়ি বোঝাই পাকা ফসল নিয়ে বাড়ি ফেরা, ফসল মাড়াই, নানা আয়োজনের সুচিত্রিত বিন্যাস। বর্ষার বাংলার প্রকৃতিকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শ্রমে-ঘামে সিক্ত হয়েই একজন কৃষকের দৈনন্দিন পথ চলা – তা এ ছাপচিত্রের মাঝে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। এ চিত্রে কৃষকের পুরো কপাল জুড়ে দুঃচিন্তার বলিরেখা; চোখে-মুখে হতাশার ছোঁয়া। চিত্রের এ কৃষক একজন বর্গাচাষিও হতে পারে – যে চাষিদের জীবনযাপন নিদারুণ কষ্টের, সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উৎপন্ন ফসলের পুরোটাই চলে যায় জমিদার-জোতদারদের ঘরে; ফলে প্রাপ্ত সামান্য ফসলে কৃষকের সংসার চালানোই দায়, কৃষকের এ মুখাবয়ব আমাদের চল্লিশের দশকের 'তে-ভাগা' আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কৃষকের মুখে একগুচ্ছ দাড়ি আর গলায় ঝোলানো তাবিজ থেকে বাংলার লোকধর্ম বা লৌকিক ইসলামের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য এর লাইন বা রেখার ব্যবহার। ব্যুরিনের আঁচড়ে নানা রকম রেখার বিস্তার চিত্র জুড়ে, সাথে রয়েছে আলো-ছায়ার যথাযথ উপস্থাপন। পুরোপরি বর্ণনামূলক এ চিত্রে কৃষকের মুখচ্ছবি যেন বাংলার কৃষকের জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি।

ঘরে ফেরা বা বাড়ির পথে

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে সফিউদ্দীনের প্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্র হলো – 'ঘরে ফেরা' বা 'বাড়ির পথে' (১৯৪৪)।

এ চিত্রে গোধূলিলগ্নের আকাশ; আকাশের অপার সৌন্দর্য, সারি সারি তালগাছের অপরূপ শোভা, বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর আলো-আঁধারী খেলা, রাঙাধুলোর মেঠোপথ বেয়ে চলা মহিষের দল – সবকিছু মিলে এক মুনোমুগ্ধকর রূপের অবতারণা করেছেন শিল্পী এ ছাপচিত্রের মধ্য দিয়ে।

এ চিত্রের পশ্চাৎভূমির পুরোটাজুড়ে রয়েছে সুবিশাল আকাশ। ব্যুরিনের আঁচড়ে নানা রেখার ব্যবহার করেছেন শিল্পী। এ রেখা কখনো মোটা, কখনো সরু, কখনো সরল, কখনো রৈখিক; অর্থাৎ গতিশীল রেখার বহুভঙ্গিম উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। কাঠের শক্ত বুক চিরে আকাশের প্রতিরূপ সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শিল্পী। গোধূলি বেলার ক্ষীণ আলোর পরশ ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র চিত্রপট জুড়ে। সুউচ্চ তালগাছের সারির ধার ঘেঁষে বাড়ি ফিরছে মহিষের দল, দলের শেষে পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে রাখাল – সবকিছু ঘনকালো হয়ে উঠেছে। মাঠের ওপর পড়েছে ক্ষীণ আলো; যা অতি সুক্ষ্মরেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ চিত্রটিতে উড-এনগেভিংয়ের মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্যসহ এর কম্পোজিশন, রেখার সুচারু ব্যবহার ও আলো-আঁধারী খেলায় শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমের সার্থক শিল্পকর্ম এটি।

সাঁওতাল রমণী

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো 'সাওতাল রমণী' (১৯৪৬)।

এ চিত্রটি মূলত দুইজন সাঁওতাল রমণীর জলাশয় থেকে জল সংগ্রহের দৃশ্যরূপ। ঘনবৃক্ষরাজির মাঝে জলাশয় থেকে দুই রমণীর কলসে জল-ভরার বিশেষ মুহূর্তকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে এ চিত্রে। রমণীদ্বয়ের একজন জল ভরতে মগ্ন, আরেকজন দূরপানে চেয়ে রয়েছে চকিত নয়নে।

এ চিত্রের মূল আকর্ষণ হলো এর কম্পোজিশন বা বিন্যাসরীতি এবং আলো-ছায়ার পরিমিত ব্যবহার। আলো-আঁধারী পরিবেশে দুই রমণীকে চিত্তাকর্ষকভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে – পরনের শাড়ির ভাঁজে, গলায় ধাতব বা পুঁতির মালা, হাতে বালা, বাজুবন্ধ, কানে দুল, খোপায় গোঁজা ফুল, এসবের মাঝে সাঁওতাল রমণীদের শারীরিক ও মানসিক সৌকর্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ চিত্রে আলো ঠিকরে পড়ছে রমণীদের দেহাবয়বে, শাড়ির ভাঁজে আর জলের বুকে। আলো পড়েছে গাছের গুড়িতে; পত্রমঞ্জরির শাখায়-শাখায়। প্রকৃতপক্ষে আলো-ছায়ার যথাযথ ব্যবহারেই এ চিত্রটি আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। চিত্রের পশ্চাৎভূমিতে দুই নর-নারীকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। মোটা ও সরু ব্যুরিনের দক্ষ ব্যবহারে ছাপচিত্রটি পেয়েছে অনন্য মাত্রা। 'সাঁওতাল রমণী' শীর্ষক এ চিত্রটি সম্পর্কে চিত্র সমালোচক হারকোর্ট রবার্টসন 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখেন, "সফিউদ্দিনের 'সাঁওতাল রমণী' কেবল একটি রসপুষ্ট চিত্রই নয়, ইহা তাঁহার মহৎ শিল্পসম্পদের একটি রূপবান নির্দশন।" (মাহমুদ, ২০০২: ৬০)

এ চিত্রের রমণীদ্বয়ের জলভরার দৃশ্য শুধু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নয় বরং বাংলার সমগ্র নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রতিচিত্র।

মেলার পথে

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হলো 'মেলার পথে' (১৯৪৭)। আনুভূমিক বিন্যাসের এই চিত্রটি বাংলার গ্রামীণ জনপদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার দৃশ্যরূপ।

এ চিত্রের মূল বিষয় হলো, গ্রামের আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ বেয়ে চলা একদল মানুষ, যারা চলেছে মেলার পানে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 'মেলা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

> মেলার একটা সাধারণ কিন্তু প্রধান কাজ হলো নানা মন, মত ও স্বভাবের মানুষকে মেলানো। এই মিলন একদিকে মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করে, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ ঘটায়, যাত্রা, জারি, সার্কাস, পুতুল নচের মাধ্যমে বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে, তত্ত্বকথা ও ভক্তির প্রকাশে আত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায়,... অন্যদিকে গ্রুপ বা কমিউনিটির চেতনাকে সংহত, সামাজিক ঘনত্বকে উষ্ণ এবং বিশেষ দার্শনিক বোধ বা বিশ্ববীক্ষাকে চলমান রাখে। এই দুই ধরনের ফাংশন ছাড়াও গৃহস্থালির তৈজসপত্র, সাংবাৎসরিক সাংসারিক প্রয়োজনের জিনিসপত্রের সংগ্রহ, বিনিময় এবং ক্রয়-বিক্রয়ও মেলার অন্যতম কাজ, ... এদেশের মেলা-সংস্কৃতি জীবনসংলগ্নতা ও আনন্দময়তার এক প্রবল সংস্কৃতিই বটে। (শামসুজ্জামান, ২০১৩: ৬৭)

মেলার তাত্ত্বিক, আত্মিক ও উপযোগিতামূলক দিক রয়েছে বলেই এক জায়গায় সম্মিলন ঘটে বহুমানুষের। এ চিত্রের মানুষগুলোও যেন সে লক্ষ্যে ছুটছে মেলার পথে।

এ চিত্রের অগ্রভাগে রয়েছে দুটি বৃক্ষ; বৃক্ষ দুটির মাঝে দিয়েই যেন দৃষ্টিগোচর হয় সবকিছু। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মেলার পথে চলেছে এক ব্যবসায়ী; মাথার ওপর ধরে রেখেছে বিশেষ ধরনের পাতার ছাতা এবং ঘোড়ার পিঠে নানারকম ব্যবসায়িক সামগ্রীতে ঠাসা। মেলায় যে নানা সম্প্রদায়ের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে এ চিত্রে সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ছাতা মাথায় এক রমণী, যার সাথে হেঁটে চলেছে এক নগ্ন শিশু। ঘোড়সওয়ারের সাথে ছুটে চলেছে এক কুকুর। কুকুরের চলার ভঙ্গি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; অনেক বেশি বাস্তবানুগভাবে ধরা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় চলেছে গরুর গাড়ি; কাছে দূরের দোলাচলে পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পী। সমগ্র চিত্রজুড়ে একধরনের গতিময়তা লক্ষ করা যায়, যা শিল্পী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছায়াময় দুই বৃক্ষর ফাঁক দিয়ে কোমল আলোয় উদ্ভাসিত চিত্রের কেন্দ্রভূমি, আলো পড়েছে ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়সওয়ারের ছাতার কিনার জুড়ে, গাছের গুড়িতে, পত্রমঞ্জরির বুক জুড়ে। ঘোড়সওয়ারের তালি লাগানো জামা, মায়ের সাথে নগ্ন শিশুর পায়ে পায়ে পথ চলা – যেন এক নিম্নবর্গীয় মানবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে মেলার এ যাত্রীসকল।

ব্যুরিনের যথাযথ ব্যবহারে শিল্পীর দক্ষতার বিষয়টি যেমন স্পষ্ট, তেমনি ব্যুরিনের নানা রকম কারিকুরি আর বুনোট চিত্রটিকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এ চিত্রের মূল আকর্ষণ হলো চিত্রের আলো-আঁধারী খেলা, পরিমিত আলোকসম্পাতের ফলে চিত্র হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর।

গুনটানা

শিল্পী সফিউদ্দীনে.র সমবিমূর্ত ধাঁচের উড-এনগ্রেভিং চিত্র হলো 'গুনটানা' (১৯৫৫)।

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিতে গুনটানা অবস্থায় দুইজন মাঝিকে উপস্থাপন করা হয়েছে স্টাইলাইজডভাবে। এখানে নৌকা বা নৌকার পাল দৃশ্যমান না হলেও যেন প্রতীকীভাবে উপস্থিত, নদীতীর ধরে ছুটে যাওয়া দুই মাঝি সকল বাধা-বিপত্তিকে মাড়িয়ে দীপ্তপায়ে সম্মুখপানে ধাবমান।

চিত্রের ঢেউখেলানো গীতল রেখাগুলো যেন প্রবহমান নদীর জলের প্রতিনিধিত্ব করে। উড়ন্ত পাখির উপস্থিতি, নিরন্তর প্রবহমান জলধারা – যেন একধরনের গতিময়তাকে ইঙ্গিত করে। গতিশীলতা প্রকাশ পায় মানবদেহাবয়বেও। গতিময়তা এ চিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

জ্যামিতিক ফর্ম আর রেখায় কিছুটা আলংকারিক বা নকশাধর্মী ধাঁচ পেয়েছে চিত্রটি। চিত্রে মানবদেহাবয়বে আলো ঠিকরে পড়েছে, যা আরোপিত হয়েছে ছবির মূল বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজনে। শিল্পীর কারিগরিকুশলতা বা ব্যুরিন চালানোর মুন্সিয়ানা অসাধারণ। মোটা-সরু ব্যুরিনে নানাভাবে খোদাইয়ের ফলে রেখা আর বুনোটে এসেছে বৈচিত্র্যময়তা।

সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নিরন্তন ছুটে চলাই যে সংগ্রামশীল জীবনের মূল কথা – এ চিত্রে শিল্পী সে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে।

বন্যা

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে সফিউদ্দীন আহমদের সর্বশেষ চিত্র হলো 'বন্যা' (১৯৫৬)।

১৯৫৪-৫৫ সালের দুর্বিষহ বন্যার ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় আঁকা এ চিত্র। এ চিত্রটিতে আঁকা হয়েছে মূলত ঢাকার স্বামীবাগের বন্যার দৃশ্য। কারণ শিল্পী এ সময় স্বামীবাগে

বসবাস করতেন। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিতে বন্যাপ্লাবিত জনজীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এ চিত্রে দেখা যায়, বন্যার তোড়ে ডুবে গেছে সমগ্র লোকালয়, মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছনের বা খড়ের দোচালা ঘরবাড়ি, খড়ের গাদা। এ সময় মানুষের চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা, নৌকায় করে মানুষ খাবারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বহন করে চলেছে – যা খুবই অপ্রতুল। প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের পাশ দিয়ে দুজন মানুষ কোমরসমান পানি ডিঙিয়ে হেঁটে চলেছে; যাদের একজনের মাথায় খড় এবং অন্যজনের মাথায় ডালা; তারা হয়ত খুঁজে ফিরছে শুকনা আবাস বা নিরাপদ আশ্রয়।

বৃক্ষের অপর পাশের বাড়ির বারান্দার মাচায় মাটির চুলাসহ অন্যান্য পাত্র লক্ষ করা যায়। অন্ধকারের বিপরীতে আলোর খেলা – উড এনগ্রেভিংয়ের যে মূল বৈশিষ্ট্য তা এ চিত্রে পুরোপুরি বিদ্যমান। ঘরবাড়ি, গাছপালা অন্ধকারে নিমজ্জিত; আলো ঠিকরে পড়ছে বন্যার জলরাশিতে, আলোর প্রতিফলনে জলের স্বচ্ছতা আর প্রবহমাণধারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আলো পড়েছে ঘরের চালায়, গাছের গুড়িতে; তবে অতটা প্রকট নয়। অন্ধকার আর স্বল্প আলোর মাখামাখিতে চিত্রটিতে ফুটে উঠেছে বেদনাঘন পরিবেশ। ব্যুরিনের সূক্ষ্ম ব্যবহারে জলের স্রোতোধারার যে বৈশিষ্ট্য তা বিম্বিত হয়েছে সুচারুরূপে। বন্যাপীড়িত মানুষের দুর্বিষহ জীবনযাত্রার কাহিনিই যেন বিধৃত হয়েছে এ ছাপচিত্রটির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সার্থকভাবে।

ড্রাইপয়েন্ট চিত্র

ড্রাইপয়েন্ট – ইন্টাগলিও বা অন্তর্লীন ছাপচিত্রের মাধ্যম। ধাতবপাতে এসিড প্রতিরোধী গ্রাউন্ডের প্রলেপ না দিয়ে নিডলের সাহায্যে সরাসরি আঁচড় কেটে এবং এসিডে দ্রবীভূত না করে ছাপ নেওয়ার পদ্ধতি হলো ড্রাইপয়েন্ট। (কমল, ২০০৯: ২২৫) এ মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত পাতে আঁচড়কৃত রেখার দুই পাশ খানিকটা উঁচু হয়ে থাকে; যা প্লেটে অতিরিক্ত কালি ধারণ করে রাখে। এ অতিরিক্ত কালির ছাপই ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমের বিশেষত্ব। তবে এ মাধ্যমে খুব বেশি ছাপ নেওয়া সম্ভব নয়।

ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমের প্রতিও সফিউদ্দীন আহমদের আকর্ষণ ছিল। এ মাধ্যমের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন মূলত কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দের ড্রাইপয়েন্ট চিত্র দেখে। মুকুল দের ড্রাইপয়েন্ট চিত্র সফিউদ্দীনের কাছে যেন কাব্যের আবেদন সৃষ্টি করে। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৪২) ফলে এ মাধ্যমেও তিনি বেশ কিছু কাজ করেন।

দুমকার শালবন ও মহিষ

ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমে আঁকা সফিউদ্দীনের প্রথম চিত্রকর্মটি হলো 'দুমকার শালবন ও মহিষ' (১৯৪৪)।

উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটি মূলত দুমকা এলাকার দৃশ্যরূপ। 'কাট অব এজ' কম্পোজিশনের এ চিত্রে দেখা যায় মোটা পথের দু-পাশ জুড়ে সুদীর্ঘ শালগাছের সারি এবং রাস্তা পার হওয়া অবস্থায় মহিষের দল। এত দীর্ঘ শালগাছগুলোর তুলনায় মহিষগুলো অতি ক্ষুদ্রাকার – এর মাধ্যমে শিল্পী যেন প্রকৃতির বিশালতাকেই মেলে ধরেছেন। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য।

শালগাছগুলোতে আলো পড়েছে তীর্যকভাবে। সুউচ্চ শালগাছের ছায়া পড়েছে রাস্তার বুকে। সামনের গাছটি অনেক গাঢ় রঙে চিত্রিত, তবে দূরের গাছগুলো তুলনামূলকভাবে হালকা হয়ে গেছে – যা পরিপ্রেক্ষিতের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

ড্রাইপয়েন্টের মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। ধাতবপাতে সুচের আঁচড়ে সৃষ্ট ওকড়ায় ধারণকৃত রঙের ছোপ ছোপ রূপ এ চিত্রকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। সৈয়দ আজিজুল হকের মতে – 'চিত্রটির আবেদন অনেকটা কবিতার মতো' (২০১৩: ৪২)।

আলো-ছায়া, পরিপ্রেক্ষিত ও মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্যের গুণে এ চিত্রটি উৎকর্ষ লাভ করেছে।

ময়ূরাক্ষী তীরে দুই নারী

এ মাধ্যমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র হলো 'ময়ূরাক্ষী তীরে দুই নারী' (১৯৪৫)। এ বিষয়টি নিয়ে শিল্পীর একটি তেলরং চিত্রও রয়েছে। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রে দুই সাঁওতাল রমণীকে নদীতীরে উপবিষ্ট অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা বসে আছে শূন্য কলস নিয়ে; চাহনি তাদের নদীর দিকে, দূরে হাটুজলে ময়ূরাক্ষীর ক্ষীণ জলধারার মাঝে মাথায় কলসি নিয়ে দুই নারীকে দেখা যায়; নদীর অপরপ্রান্তে পাহাড়ের উপস্থিতি; সবকিছু খুব হালকা রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রের অগ্রভাগের দুই নারীতে সাঁওতালী জীবনধারার বৈশিষ্ট্য প্রকট। তাদের শরীরের অনেকটাই অনাবৃত, তাদের হাতে বালা, গলায় মালা, কানে দুল, মাথায় গোঁজা ফুল সবকিছুর মধ্য দিয়ে সাঁওতাল নারী জীবনের শাশ্বত রূপ ফুটে উঠেছে। আলো-ছায়া, পরিপ্রেক্ষিত ও সুচারুবিন্যাসে অনবদ্য চিত্রকর্ম এটি।

শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট

ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সর্বশেষ চিত্রকর্ম হলো 'শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট' (১৯৪৫)।

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি যেন বীরভূমের চিরচেনা রূপের প্রতিচ্ছবি। এ চিত্রে দেখা যায় বিস্তীর্ণভূমির বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি তালগাছ। উঁচু-নিচু মেঠোপথ ধরে চলেছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী; কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ-বা পায়ে হেঁটে। চিত্রের অগ্রভাগের তৃণভূমি, উঁচু-নিচু মাটির ঢিবি, সামনের তাল গাছগুলো অনেক গাঢ় রঙের এবং ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেছে। অনেক দূরের গাছগুলো খুবই হালকা হয়ে ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়েছে বিলীয়মান রেখায় – অসাধারণ পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার।

আলো-ছায়ার ব্যবহারেও শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ড্রাইপয়েন্টের বিশেষত্ব এ চিত্রে প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সাঁওতালী জীবনধারার পাশাপাশি বীরভূমের অসাধারণ সুন্দর নিসর্গদৃশের অবতারণা করেছেন শিল্পী এ চিত্রের মধ্য দিয়ে। এককথায় দৃষ্টিসুখকর, মনোমুগ্ধকর দৃশ্যরূপ এ চিত্রটি।

অ্যাকুয়াটিন্ট চিত্র

অ্যাকুয়াটিন্টও ইন্টাগলিও বা অন্তর্লীন ছাপচিত্রের মাধ্যম। অ্যাকুয়াটিন্ট শব্দটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে বলা যায় যে, 'অ্যাকুয়া' অর্থ জল আর 'টিন্ট' অর্থ রং-এর আভা বা রূপভেদ বা ছোপ। জলরঙের মতো টোনাল ইফেক্ট বা বর্ণবিভার সৃষ্টি করা হয় বলে এ পদ্ধতিকে অ্যাকুয়াটিন্ট বলে। (কমল, ২০০৯: ২৩)। জিঙ্ক বা দস্তার পাতে রজনগুঁড়া ছড়িয়ে তা হালকা তাপ দিতে হয় যেন রজনগুঁড়া উঠে না যায়। রজন গুঁড়ার বিন্দু বিন্দু ইফেক্টই এ ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। আলো-আঁধারী পরিবেশ সৃষ্টিতে কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় ছাপ তৈরির প্রক্রিয়া।

সফিউদ্দীন আহমেদ অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে যেসব ছাপচিত্র নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৪৫), 'পারাবত' (১৯৪৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ময়ূরাক্ষী

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিতে ময়ূরাক্ষী নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চিত্রে শুষ্ক অবস্থার ময়ূরাক্ষী নদীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নদীর কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে চর; ক্ষীণ জলধারা নিয়ে কুলকুল করে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে

ময়ূরাক্ষী। পানি কোথাও কোমর সমান, কোথাও পায়ের গোড়ালি অবধি। ফলে খুব সহজেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নর-নারীরা পারাপার হতে পারে। কেউ নদীতে গোসল করছে; কেউবা জলভরে ফিরছে বাড়ির পথে, অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের যে বৈশিষ্ট্য তা এখানে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

কয়েকটি গ্রেডের মাধ্যমে ময়ূরাক্ষী নদীর বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জেগে ওঠা নতুন চরের নরম কোমল মাটি বুঝাতে কালো রঙের আভা এবং জলধারাকে তুলনামূলক হালকা টোনে রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে চরের নরম কাদায় মানুষের পদচিহ্নের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

ঝিকিমিকি আলোর প্রতিফলনে জলের ধারা কোথাও কোথাও খুবই স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। আলো পড়ে নদীর পাড়ের বালু কোথাও কোথাও চিকচিক করছে। নদীপাড়ের পাহাড় আর ঝোপ বোঝাতে রঙের কয়েকটি গ্রেড ব্যবহৃত হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর রূপমাধুর্য ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনধারার বিষয়টিও প্রতিভাত করেছেন শিল্পী। বিন্যাস, আলো-ছায়া ও মাধ্যমের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের যথাযথ রূপায়ণে চিত্রটি সার্থক রূপ পেয়েছে।

পারাবত

এ মাধ্যমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো – 'পারাবত' (১৯৪৫)। শিল্পী সফিউদ্দীন কলকাতায় বালিগঞ্জে কয়লার ডিপোতে স্কেচ করতে যেতেন নিয়মিত। সেখানে এক বস্তিতে বাঁশের খুঁটিতে গরুর গাড়ির চাকা বসিয়ে তার ওপর খোপ-খোপ বাক্স সদৃশ কবুতরের বাসা তৈরি করা হয়েছিল, যা শিল্পীকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। এ দৃশ্যের একটি স্কেচ করেন; যা পরবর্তীকালে তেলরং ও অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে 'পারাবত' (১৯৪৫) শীর্ষক চিত্র রচনা করেন।

'পারাবত' শীর্ষক অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা চিত্রটিতে কবুতরের জীবন প্রক্রিয়া ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছোট ছোট খোপে বাস করা, বেড়ে উঠা; উড়াউড়ি সবকিছু মেলে ধরেছেন শিল্পী।

চিত্রের কেন্দ্রভূমিতে স্থান দেওয়া হয়েছে যে কবুতরের খাঁচা, সেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পুরোপুরি। বাঁশের খুঁটি, চাকার নিম্নাংশ ঘন কালোতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। খোপের ওপর আলো পড়েছে তির্যকভাবে। কোথাও আলো; কোথাও ছায়া, আলো-আঁধারী খেলায় কবুতরের খাঁচাটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি বাস্তবানুগভাবে। চিত্রের পাশ্চাৎভূমিতেও আলো-আঁধারী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের গ্রেইনি ইফেক্টের দ্বারা। ঘনকালোর বিপরীতে শ্বেত কবুতরগুলোর রূপদানে স্পষ্টতা লক্ষ করা যায়।

কবুতরের সংখ্যা নির্ধারণেও যেন শিল্পীর হিসাবী মনের পরিচয় পাওয়া যায় – এ হিসাব কম্পোজিশনের ভারসাম্য রক্ষার্থেই। দুদিকের টানা দড়িও চিত্রের বিন্যাসের ভারসাম্য রক্ষা দারুণভাবে।

এ চিত্রের কম্পোজিশন ও আলো-ছায়ার ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে বর্ণবিভার যে বৈচিত্র্য ও স্বচ্ছতা তা এ চিত্রে প্রতিভাত হয়েছে সার্থকভাবে।

এচিং-অ্যাকুয়াটিন্ট

এচিং-অ্যাকুয়াটিন্ট হলো অন্তর্লীন ছাপের মিশ্র পদ্ধতি। ধাতবপাতে প্রথমে এচিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। এচিং পদ্ধতিতে জিঙ্ক বা দস্তার ধাতব পাত ব্যবহৃত হয়। ধাতব পাতটিতে প্রথমে এসিড প্রতিরোধী গ্রাউন্ডের প্রলেপ লাগাতে হয়। তারপর ধাতব পাতে কাঙ্ক্ষিত চিত্র পরিস্ফুটনে নিডল দিয়ে আঁচড় কেটে এসিডে বাইট করিয়ে প্লেট প্রস্তুত করা হয়। (Elizabeth, 1994: 185) এচিং-অ্যাকুয়াটিন্টের মিশ্র মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রথমে ধাতব পাতে এচিংয়ের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রেখা সৃষ্টি সম্পন্ন হলে ধাতব পাতে রজন গুঁড়া ছড়িয়ে অ্যাকুয়াটিন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ছাপের জন্য প্লেট প্রস্তুত করতে হয়।

শিল্পী সফিউদ্দীন এচিং ও অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের সমন্বয়ে বেশকিছু শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। যেমন – 'মাছ ধরার সময়' (১৯৫৭), 'নেমে যাওয়া বান' (১৯৫৯), 'সেতু পারাপার' (১৯৫৯), 'বিক্ষুব্ধ মাছ' (১৯৬৪), 'নীলজল' (১৯৬৫) ইত্যাদি।

মাছ ধরার সময়

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট ও সফটগ্রাউণ্ড মাধ্যমে আঁকা। সফিউদ্দীনের এ চিত্রের মধ্য দিয়েই ছাপচিত্রে রঙের সমাবেশ ঘটে। এ চিত্রটি গ্রামবাংলার মাছ ধরার চির পরিচিত রূপ। বিশালাকৃতির একটি জালকে বাঁশের সাথে বেঁধে পানিতে পেতে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর তা উঠিয়ে প্রাপ্ত মাছ নৌকায় রাখা হয়। কাজটি সম্পন্ন হয় একজন ব্যক্তির মাধ্যমে – চিত্রটিতে সে দৃশ্যেরই যেন অবতারণা করা হয়েছে সমবিমূর্ত ধাঁচে।

এ চিত্রটিতেও জালকে স্বাভাবিকভাবে অনেক বড় করে আঁকা হয়েছে, মানুষ আঁকা হয়েছে ছোট করে। 'প্রকৃতির পটভূমিকে মানুষ কত ছোট আবার একই সঙ্গে সে কত শক্তিমান এই বোধকেও এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৪৮)

চিত্রটিতে মানুষ, নৌকা, বাঁশের খুঁটি, জালের কিনার এচিং মাধ্যমে লাইন ড্রইংয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। কালো রঙের ছোপ, প্রতীকী জলরাশি অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে এবং হলুদ রঙের জালের রূপায়ণে সফটগ্রাউন্ড মাধ্যমে মশারি, মোজার দ্বারা ছাপ দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড গতিময়তা লক্ষ করা যায় এ চিত্রে, যা চিত্রের বিষয়বস্তুর সাথে পরিপূরক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাদা-কালো ও হলুদ রঙের মিশেলে এটি এক অনবদ্য শিল্পকর্ম।

নেমে যাওয়া বান

'নেমে যাওয়া বান' (১৯৫৯) শীর্ষক এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিতে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর প্রকৃতি যে রূপ ধারণ করে তা বিধৃত হয়েছে। সমবিমূর্ত রীতির এ চিত্রের পুরোভূমি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে একটি গাছের রূপকল্প বা ইমেজ। নিম্নভাগে স্থির পানি ও নৌকা এবং পশ্চাৎভাগে ঘরের চালার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পানিতে নীল, ঘরের চালা আর পাতার রূপকল্পে লাল; পশ্চাৎভূমিতে খয়েরি এবং কালোর মিশেলে রূপ দেওয়া হয়েছে চিত্রটি। নৌকা ও গাছের পাতার ঝোঁপে কোথাও কোথাও অফহোয়াইট রং প্রয়োগে পুরো চিত্রজুড়ে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে চমৎকারভাবে।

এ চিত্রের দুটি প্যানেলে দুটি রঙের প্রাধান্য, নিচের দিকে নীল কালোর গাঢ় ছায়ায় বন্যার দুর্বিষহ জীবন এবং ওপরের দিকের লাল ও অফহোয়াইট রঙে নতুন দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নতুন উদ্দীপনার ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দুঃখের দিন শেষে আশার আলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রঙের সুচিন্তিত ব্যবহারে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমন্বয়ে আলো-আঁধারী খেলায় অনবদ্য শিল্পকর্ম এটি।

সেতু পারাপার

অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের উল্লেখযোগ্য আরেকটি শিল্পকর্ম হলো 'সেতু পারাপার' (১৯৫৯)। উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটি এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা। এ চিত্রের মাঝ বরাবর দিয়ে একটি সেতু দৃশ্যমান। সেতুর নিচের পানির প্রবাহ, নৌকা, ঘরবাড়ি মানুষ সববিমূর্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এচিং মাধ্যমে নানা রেখার সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু বর্ণবিভার যে বৈশিষ্ট্য তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অ্যাকুয়াটিন্টের সূক্ষ্ম দানাদার ইফেক্টের মধ্য দিয়ে। চিত্রের পুরো অংশ জুড়েই গাঢ় রঙের আধিক্য এবং ক্রমান্বয়ে সে গাঢ়ত্ব হালকা হয়ে এসেছে, এবং চিত্রের যে অংশটিতে চোখ স্থির হয়ে যায় সে অংশ পুরোপুরি সাদা রাখা হয়েছে। ঘূর্ণায়মান রেখার দ্বারা গতিময় রূপ প্রতিভাত হয় এ চিত্রে। এ চিত্রের কম্পোজিশনের ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়েছে নানা রেখা। চিত্রের নিচের দিকে গাঢ় ছায়ার মাঝে নৌকার ফর্ম এবং ওপরের দিকে বাঁ পাশে গাঢ় রঙের প্রয়োগে চিত্রে রঙের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে যথাযথভাবে।

প্রচণ্ড আলো ঠিকরে পড়েছে সেতুর এক অংশে, নৌকা আর পানির ওপর। সমগ্রচিত্রের ঘন আঁধারী পরিবেশে এ আলোই চিত্রটির মূল আকর্ষণ। অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের সর্বোত্তম প্রয়োগে অনন্য শিল্পকর্ম এটি।

'মাছ ধরার সময়-১' (১৯৬২) আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা। পুরোপুরি বিমূর্তরীতির এ চিত্রটি মূলত রং রেখা ও ফর্মের সমাহার। সাদা-কালো, হলুদ আর নীলাভ সবুজ রঙের ছান্দসিক বিন্যাসে অঙ্কিত এ চিত্রটি।

এ চিত্রে সরু ও মোটা লাইন দিয়ে জাল, নৌকার গলুইসহ নানা গড়ন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নীলাভ-সবুজে জলের উপস্থিতি এবং হলুদের মধ্যে অসংখ্য বিন্দু; যেন বালুময় তটরেখা। নানারেখা ও রঙের সুরেলা উপস্থাপনে নদী-নৌকা, জাল মাছের রূপকল্প ফুটে উঠেছে এবং চিত্রটিকে দিয়েছে অনন্যমাত্রা। 'মাছ ধরার সময়-২' (১৯৬২), 'নীলজল' (১৯৬৪), 'বিক্ষুব্ধ মাছ' (১৯৬৪) এ রীতিতে আঁকা ছাপচিত্র।

বিক্ষুব্ধ মাছ

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি এচিং-অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা। এ চিত্রটিও রং-রেখা ও ফর্মের সুরেলা উপস্থাপন। এখানে সরু রেখা দ্বারা জালের উপস্থিতি এবং স্থূল রেখা ও অন্যান্য ফর্ম, বিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে বিন্যাসের ভারসাম্য রক্ষার্থেই। গাঢ় কালোর বিপরীতে সাদা রং দিয়ে আলো-ছায়ার প্রকটতা নিরূপণ করা হয়েছে। হলুদ ও লাল রঙে মাছের রূপদানে এক ধরনের প্রাণময়তার ভাব ফুটে উঠেছে, তেজোদীপ্ততার বিষয়কেও ইঙ্গিত করে যেন।

এ শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক সৈয়দ আজিজুল হকের (২০১৩: ৫৩-৫৪) ভাষ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

> 'বিক্ষুব্ধ মাছ' শীর্ষক চিত্রটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জালে আবদ্ধ মাছটির চোখে যে বিক্ষোভের আগুন তা তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাশাসকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শৃঙ্খলিত মানুষের অন্তঃক্ষোভেরই প্রতীকী প্রকাশ। স্মরণীয় যে, মাছ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং জাতীয় জীবনের মর্মবেদনাকে রূপায়িত করার জন্য মাছের এই ব্যবহার চিত্রটিকে অন্যভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

এ চিত্রে বিক্ষুব্ধ মাছের উপস্থিতিতে বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং রং রেখা ও ফর্মের মাধ্যমে তা ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে।

জলের নিনাদ

সফিউদ্দীন আহমদের এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে করা সর্বশেষ চিত্রের উদাহরণ হলো ‘জলের নিনাদ’ (১৯৮৫), তবে এ চিত্রটি শুধু এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট নয়; অন্তর্লীন ছাপের প্রায় সকল মাধ্যম অর্থাৎ এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, সুগার অ্যাকুয়াটিন্ট, মেজোটিন্ট, লিফট গ্রাউণ্ড, এনগ্রেভিং, ড্রাইপয়েন্ট প্রভৃতির সমন্বয়ে চিত্রটির রূপ দেওয়া হয়েছে।

বন্যার স্মৃতিকে ভর করে শিল্পী এ চিত্র নির্মাণ করেন। বন্যার অভিজ্ঞতা যেন তাঁর মজ্জাগত। বন্যার পানিতে বৃষ্টির ফোটায় যে আবহ তৈরি হয় তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুধাবন করেছেন, অনুভব করেছেন। আর তখন থেকেই তিনি এমন একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। ১৯৫৯ সালে প্যারিস ভ্রমণ এবং আরো পরে সত্তরের দশকে লেলিনগ্রাদ সফরের সময় অর্কেস্ট্রার সুর শোনেন, যে সুর তাঁকে এ চিত্র রচনার প্রেরণা দেয়। অর্কেস্ট্রা বাজাতে প্রয়োজন হয় অনেক যন্ত্রীর; এবং ব্যবহৃত হয় নানা বাদ্যযন্ত্র। অর্কেস্ট্রার সুর কখনো নিম্নগামী আবার কখনো ঊর্ধ্বগামী হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে। অর্কেস্ট্রার এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে অন্তর্লীন ছাপচিত্রের সকল মাধ্যমকে একত্র করে প্রায় তিন বছরের সাধনায় রচনা করেন ‘জলের নিনাদ’ শীর্ষক এ শিল্পকর্মটি। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৫৬) পুরোপুরি বিমূর্ত রীতির আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটির পুরো জমিন জুড়ে রয়েছে পানির ফোটা, পানির প্রবাহ। পানির এ ফোটাগুলো যেন চিত্রতল থেকে উঁচু হয়ে রয়েছে। চিত্রটিতে মাছ ধরার আবহ ফুটে উঠেছে। ফলে জাল, মাছ, নৌকার ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো চিত্র জুড়ে হালকা সবুজের আবহ এবং তার ওপর অফহোয়াইট রঙের পানির ফোটা সদৃশ বুনট। কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে হলুদ রং। এ চিত্রটিতে কিছুটা নকশার রূপ লক্ষ করা যায়, যা ব্যবহৃত হয়েছে বিন্যাসের প্রয়োজনেই। প্রথমে সাদা রেখা, তার নিচে হালকা সবুজ রঙের জলের ছাপ এবং তার পাশে ঘন সবুজ রঙের আবহ চিত্রে এক ধরনের ভলিয়্যুম তৈরি করেছে।

এ চিত্র প্রসঙ্গে শিল্প সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের (২০০০: ৩৯) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ‘জলের নিনাদ’ কাজটি শিল্পী সফিউদ্দিনের ঋদ্ধি ও সিদ্ধির একটি বড় ঠিকানা। সঙ্গীতের চিত্রল তর্জমা এটি। প্রকৃতির কোনো চেনা অনুষঙ্গ নেই।... চিত্র ভাষার শুদ্ধ উপাদান রেখা, বর্ণপ্রস্থ, ঘণায়মান বিন্দু, মন থেকে উৎসারিত স্বাধীন গড়ন – এইসব মিলে হৃদয় আপ্লুত করা অর্কেস্ট্রা। বৃষ্টির ধ্বনি শুনিয়েছেন অনেকভাবে। বৃষ্টির ফোটা বিভিন্ন বস্তুতে পড়ে বিভিন্ন রকম শব্দে কথা বলে। জলের ওপর জল পড়ে শব্দ হয়। কড়ি ও কোমলে অন্তরের সিম্ফনি হয়ে ওঠে শেষে। বর্ণপ্রলেপগুলো আড়াআড়িভাবে রেখা দিয়ে বেঁধেছেন শিল্পী। এই মোটিভগুলো দেখলে মনে হয় আঙুল দিয়ে একটা টান দিলে যেন বেজে উঠবে। সফিউদ্দিনের জাল, নৌকা, মাছ, জল সবকিছুর সম্মিলন করেছেন সাঙ্গীতিক ইশারায়।এই মাত্রা যোজনে আমাদের চিত্রকলা সমৃদ্ধতর হয়েছে।

এ চিত্রে শিল্পীর কারিগরি কুশলতা বা নিপুণতা সর্বোচ্চ পর্যায়ের, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক অনবদ্য, মনোগ্রাহী সার্থক শিল্পকর্ম।

কপার এনগ্রেভিং চিত্র

সাধারণ ধাতবপাত তথা কপারের পাতে ব্যুরিনের সাহায্যে নানা ধরনের রেখা কেটে ছাপ নেওয়ার পদ্ধতি হলো কপার এনগ্রেভিং। (Ian Chilvers, 2012: 204) এ প্রক্রিয়ায় ছাপচিত্র নির্মাণে শিল্পীর প্রচণ্ড তক্ষণ দক্ষতার প্রয়োজন, কেননা ধাতবপাতে আঁচড়কৃত রেখাটিই চূড়ান্ত হয়ে যায়। খোদাইকৃত রেখা মোচনের কোনো সুযোগ থাকে না। এ মাধ্যমটিতেও শিল্পী সফিউদ্দীনের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ মাধ্যমে শিল্পীর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম 'জেলের স্বপ্ন' (১৯৫৭), 'হলুদ জাল' (১৯৫৭), 'গুনটানা' (১৯৫৮), 'কান্না' (১৯৮০) প্রভৃতি।

জেলের স্বপ্ন

'জেলের স্বপ্ন' কপার এনগ্রেভিং মাধ্যমে আঁকা প্রথম ছাপচিত্র। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি মূলত রেখার খেলা। বিমূর্ত ধারার এ চিত্রটির মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জেলে, নৌকা ও মাছের রূপকল্প ভেঙেচুরে, একদম অচেনারূপে।

রেখার রিদমিক বা ছান্দসিক ব্যবহার এ ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। একটি রেখা উঠে গেছে আরেকটি রেখার ওপর, মুহূর্তে পূর্বের রূপ পরিবর্তিত হয়ে নতুন আরেক রূপ বা গড়ন সৃষ্টি হয়েছে। রেখাগুলো কোথাও সরু, কোথাও স্থূল, কোথাও সরল আকার কোথাওবা রৈখিক। অর্থাৎ রেখার বহুভঙ্গিমতা এ চিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

চিত্রের ভিত্তিভূমি বা সারফেসে ফ্ল্যাট বা পুরোপুরি সমতলীয় রং ব্যবহৃত হয়েছে। পুরোজমিন জুড়ে বার্ন্ট সিয়েনা রঙের মাধুর্য লক্ষ করা যায়। বার্ন্ট সিয়েনা রঙের বিপরীতে রেখাগুলো আরো বেশি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। চিত্রের কেন্দ্রভূমিতে পুরোপুরি বিমূর্তভাবে জেলেকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যে রেখাসমূহ সেখানে রয়েছে তার স্বপ্নের নৌকা ও মাছের অবয়ব। রং ও গীতল রেখার বিন্যাসে কপারের বুকে আধুনিক কবিতার মতো এ ছবির রূপকল্প, যা ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে।

হলুদ জাল

'হলুদ জাল' (১৯৫৭) চিত্রের রয়েছে তিনটি ভাষ্য; চূড়ান্ত ভাষ্যটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। বুনটের আধিক্যই আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য। কপার এনগ্রেভিং ও সফটগ্রাউন্ড মাধ্যমে আঁকা এ চিত্রটিতে অঙ্কিত হয়েছে নানা গতিময় রেখা।

ধাতু পাতের ওপর সফটগ্রাউন্ডের মাধ্যমে মশারি, মোজা, ব্যান্ডেজের কাপড় ব্যবহার করে জালের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাপড় যেখানে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে ঘনবুনট। জালের মাঝে সৃষ্টি করা হয়েছে নৌকার রূপকল্প। চিত্রের বামদিকে রঙের গাঢ়ত্ব আর বুনটের ঘনত্ব লক্ষ করা যায়, তবে ডানদিকে বুনটের মাত্রা হালকা করা হয়েছে বিন্যাসের বিষয়টি মাথায় রেখে।

চিত্রের পুরোভূমিতে হলুদ, কমলা, সবুজ আর কালো রঙের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সফটগ্রাউন্ডের মাধ্যমে বুনট বা টেক্সচার তৈরিতে শিল্পী অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রং, রেখা আর বুনটের মিশেলে চিত্রটি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহী।

গুনটানা

'গুনটানা' (১৯৫৮) – সমবিমূর্ত ধারার এ চিত্রটিতে রেখার বহুভঙ্গিম ব্যবহারে গতিময় অবস্থাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। একটি রেখা যেন এঁকে-বেঁকে, দুমড়ে-মুচড়ে রূপ নিয়েছে দুজন মাঝির – যারা প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিয়ে চলেছে নৌকা। স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় টানার জন্য প্রয়োজন হয় গতির, এই গতির রূপদানই এ চিত্রের মূল বিষয়।

এ চিত্র রচনায় আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বিশ্বখ্যাত ছাপচিত্রী ডব্লিউ হেটারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৪২) নিজ জীবনের সংগ্রামশীল অগ্রযাত্রাকে নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত তাঁকে যে বল প্রয়োগ করতে হয়েছে সেটাই এখানে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৬০)। গুনটানার মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজ জীবনকেই টেনে নিয়ে গেছেন। চিত্রের বহুভঙ্গিম রেখা যেন জীবনের নানা প্রতিকূলতা, বাধা বিপত্তি আর এসব কিছুকেই উপেক্ষা করে সামনের পথ চলা। তবে এর জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড মানসিক শক্তি। শিল্পী যেন তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ দিয়েছেন গুনটানার মধ্য দিয়ে। সরু ও মোটা রেখার সমন্বয়ে সৃষ্ট এ ছাপচিত্রটি কপার এনগ্রেভিংয়ের অন্যতম শিল্পকর্ম।

কান্না

'কান্না' (১৯৮০) – আনুভূমিক বিন্যাসে কপার এনগ্রেভিংয়ের এ চিত্রটিতে বেশ কিছু চোখ আঁকা হয়েছে। এ চিত্রটিতে বহুভঙ্গিম রেখা আঁকা হয়েছে – রেখা কখনও সরল, কখনও রৈখিক, কখনও সরু, কখনও স্থূল আবার কখনও বর্তুলাকার। চিত্রে যেমন নানা ভঙ্গির রেখা আঁকা হয়েছে তেমনি রূপ দেওয়া হয়েছে বিচিত্র ধরনের চোখের আকৃতি। চিত্রের কেন্দ্রভূমিতে আঁকা হয়েছে বিস্ফারিত চোখের আদল; যে চোখকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে অন্য চোখগুলো। চিত্রের কেন্দ্রভূমিকে আলোকিত করে তোলা হয়েছে এবং পুরোজমিন জুড়ে রয়েছে তামাটে বর্ণের প্রলেপ।

এ চিত্র প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৩: ৬১) বলেন:

> কান্না শিরোনামের চিত্রটিতে শিল্পী মূলত এঁকেছেন 'ঝড়ের চোখ'। যে ঝড়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে দুর্যোগ, দুর্গতি ও কান্নার উৎবিন্দু, ঝড়ের ভেতরে একটা চোখ থাকে... সেই চোখকে কেন্দ্র করেই ঝড়টি আবর্তিত হয়, ক্রমশ শক্তি অর্জন করে এবং পরিণামে সর্বনাশা আঘাত হেনে প্রকৃতি ও লোকালয়ের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ঝড়ের এই চোখটিকেই শিল্পী এ চিত্রে রূপময় করেছেন।... চিত্রটির 'কান্না' নামের সার্থকতা এখানেই যে, ঝড়ের ওই চোখের মধ্যে নিহিত থাকে অগণিত মানুষের কান্নার উৎস।

কপারের বুক চিরে গতিময় রেখার রূপায়ণ ও বিন্যাসের দক্ষতায় চিত্রটি নান্দনিক ভাবনার উদ্রেক করে।

একুশে স্মরণে

সফিউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাশ্রয়ী বেশ কয়েকটি ছবি আঁকেন। ১৯৮৭ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিভূমি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আঁকেন 'একুশে স্মরণে' চিত্রটি।

কপার এনগ্রেভিং-এ ছাপা হলেও ছাপ নেওয়ার পর চিত্রে পেন্সিলের মাধ্যমে কিছু টোন দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি, ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে সফিউদ্দিন আহমেদ একজন বিশুদ্ধবাদী শিল্পী। ছাপ নেওয়ার পর তার ওপর হাতের কোনো কাজ করা তাঁর নীতিবিরোধী। কিন্তু এ চিত্রের ক্ষেত্রে তিনি সে নীতিতে অটল থাকতে পারেননি। চিত্রের প্রয়োজনেই তিনি প্রিন্ট নেওয়ার পর তাতে কিছু টোন দেন। ফলে চিত্রটি পরোপুরি তাম্রতক্ষণ ছাপ না হয়ে কিছুটা মিশ্র মাধ্যমের পর্যায়ে চলে গেছে। এ চিত্রে প্রোফাইলভাবে একটি মুখাবয়ব আঁকা হয়েছে এবং এ মুখাবয়বকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে নানা ফর্ম – চোখ, চোখের জল সহ অনেক রেখা। চিত্রের ভিত্তিভূমিতে আঁকা হয়েছে কয়েকটি প্ল্যাকার্ড, ডান দিকে রয়েছে ঘরবাড়ির আদল, ধারণা করা যায় এটি মেডিকেল কলেজ ভবনের গেট। এসব প্রতীকী উপস্থাপন আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিকে, মনে করিয়ে দেয় ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের কথা। সাদা-কালো রেখার উল্লম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটিতে 'মুখের অভিব্যক্তিতে বিষাদের ব্যঞ্জনা, অশ্রুপাত প্রভৃতির মাধ্যমে এক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সকাতর বিক্ষোভের রূপকেই চিত্রায়ণ করা হয়েছে।' (আজিজুল, ২০১৩: ৬২) এখানে উল্লেখ্য যে, 'একুশে স্মরণে' শীর্ষক ছাপচিত্রের আরো দুটি ভাষ্য রয়েছে – যে চিত্র দুটির ওপর চারকোল, ক্রেয়ন, পেন্সিলের মাধ্যমে ইমেজের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে যাকে মিশ্র মাধ্যমের রেখাচিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ চিত্র দুটির বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৩: ৩০) বলেন:

একটি মস্তককে ঘিরে নানা চোখের বিন্যাস, তাতে আছে অশ্রু, আছে বেদনা, আছে ভাষা ও দেশের প্রতি তীব্র-গাঢ়-গভীর মমতা ও অনুরাগ। ছাপচিত্রের এই রূপ থেকে সৃষ্ট রেখাচিত্রের মধ্যে 'একুশে স্মরণে-১'-এ চিন্তা-ভাবনা-বেদনাকে করা হয়েছে অন্তর্মুখী এবং 'একুশে স্মরণে-২'-এ করা হয়েছে বহির্মুখী অর্থাৎ বিষয়কেন্দ্রিক ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে। ছাপচিত্রের কোনো কোনো ইমেজকে মুছে দিয়ে নতুন ইমেজ গঠন ও চিত্রতলে টোনাল আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে রেখাচিত্র-দুটি প্রকাশ করেছে সম্পূর্ণ নতুন, স্বতন্ত্র এক আবেদন।

একাত্তরের স্মৃতি

শিল্পী ১৯৮৮ সালে কপার এনগ্রেভিং-এ আঁকেন 'একাত্তরের স্মৃতি' শীর্ষক চিত্র। এ চিত্রেও দেখা মেলে চোখ ও চোখের জলের বিচিত্র গড়ন। সৈয়দ আজিজুল হকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, শিল্পীর এ চিত্র রচনার পেছনে রয়েছে একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলোর স্মৃতির তাড়না। ঢাকা শহরসহ সমগ্র দেশ যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত তাণ্ডবে পিষ্ট, এমনই শঙ্কাময় অবস্থায় কারফিউয়ের মাঝে স্বামীবাগে পাকবাহিনীর আগমন ঘটে। পাকসেনারা একের পর এক বাড়ি তল্লাশি করলেও হঠাৎ করেই শিল্পীর বাড়ির এক বাড়ি আগে এসে থেমে যায়। শিল্পী সস্ত্রীক তাঁর বাড়ির জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখেন হানাদারদের পাষণ্ডতা। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৬২) শিল্পীর চিত্রেও বিধৃত হয়েছে ভয়ার্ত শঙ্কিত চোখের চাহনি। উল্লম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটির সমগ্র পট জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র চোখ। কোনো চোখ ক্রোধে বিস্ফারিত, কোনোটিতে হতাশা, বিহ্বলতা আবার কোনো চোখ অশ্রুসিক্ত। মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় চোখের ভাষায়, মানুষের আবেগ ও ভাবনাগুলো ভাষা লাভ করে। গ্রিক ও রোমান জাহাজগুলো সবসময় চোখের প্রতীক বহন করে যে বিশ্বাস থেকে তা হলো, যে কোনো প্রকার কুদৃষ্টি থেকে এই চোখ তাদের জাহাজকে রক্ষা করবে। (শরীফ, ২০০৬: ৮০) 'সফিউদ্দীনের চোখাকৃতি ফর্মগুলো... রূপ নিয়েছে বিভিন্ন তাৎপর্যময় রূপক ও প্রতীক হিসেবে – কখনো নীরব প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে, কখনো বিদ্রোহের, বিপ্লবের, ক্রোধের, আক্রোশের সোচ্চার প্রতীকরূপে; আবার কখনো বা আলোর উৎস কিংবা আনন্দ-বেদনা ও বিজয়-উল্লাসের মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে।' (আব্দুল মতিন, ২০১২: ৩২) হতে পারে সফিউদ্দীন আহমেদ-এর এ চিত্রের চোখ জাগ্রত বাঙালির চোখ। সমগ্র চিত্র জুড়ে ব্রাউনিশ রঙের স্বচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায়। তবে রেখাগুলোতে বার্ন্ট সিয়েনা রঙের সাথে কালো মিশিয়ে রঙের মাত্রা আরো গভীর করা হয়েছে। চিত্রপটের মাঝবরাবর আলোর প্রবাহ লক্ষ করা যায়। এ আলো নতুন আশা, সোনালি স্বপ্নের বার্তা বহন করে। সমগ্র চিত্রে ছড়িয়ে থাকা আতঙ্কগ্রস্ত চোখ অশ্রুধারার বিষাদকে আরো তীব্র করে তুলেছে সে ক্ষেত্রে এই আলো নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক হয়ে চিত্রে সুখ-দুঃখের ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুতাড়িত বন্দিশিবিরের ভয়াবহতা যে চিরস্থায়ী নয়, অন্ধকারের অবসান অবশ্যম্ভাবী

এই আলো সেই ইঙ্গিত বহন করে। রং ও রেখার ব্যবহারে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় মেলে। '৭১-এর বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রকাশ ঘটেছে এ চিত্রের মধ্য দিয়ে।

একাত্তরের স্মরণে

শিল্পী একাত্তরের স্মৃতিকে ভর করে ২০০২ সালে আঁকেন 'একাত্তরের স্মরণে' শীর্ষক চিত্র। এ চিত্রটিও কপার এনগ্রেভিং-এ ছাপা। এ ছাপচিত্রটির চারটি ভাষ্য দেখতে পাই। তবে আমরা ধারণা করি যে, এ ছাপগুলো মূলত চূড়ান্ত ছাপের পূর্ববর্তী পর্যায়। কারণ আমরা জানি যে, একটি ছাপচিত্র নির্মাণ করতে হলে কয়েকটি পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করে চূড়ান্ত ছাপটি পাওয়া যায়। এ চিত্রটির ক্ষেত্রে সে রকম পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি ধাপ লক্ষ করি। প্রথম চিত্রটি থেকে দ্বিতীয় চিত্রটিতে লাইনের কিছু আধিক্য লক্ষ করা যায়। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রের মধ্যে রঙের প্রবল তারতম্য লক্ষ করা যায়। চূড়ান্ত ছাপে এসে রঙের গাঢ়ত্ব একেবারে কম দেখা যায় এবং ছাপটি হয়ে ওঠে রেখা প্রধান। প্রথম দুটি ছাপে পুরো চিত্রতল আলোকিত হলেও তৃতীয় ও চতুর্থ ছাপে চিত্রতলের মধ্য দিয়ে শুধু আলো প্রবাহিত। তৃতীয় ও চতুর্থ ছাপে সবুজাভ রং ব্যবহার করা হয়েছে, শুধু রঙের গাঢ়ত্বের তারতম্য দেখা যায়। উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটির কেন্দ্রভূমিতে একটি মুখাবয়ব লক্ষ করা যায়, যা সম্ভবত শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতি। এ চিত্রটিতেও নানা রকম চোখের গড়ন লক্ষ করা যায়। অশ্রুতে ভিজে আছে পুরো চিত্রপট। এ অশ্রু সারা বাংলার মানুষের। সমস্ত আলোটাই গিয়ে পড়েছে অশ্রুসিক্ত বিষাদে ভরা শিল্পীর মুখাবয়বের ওপর, যেন দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেখানে এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে একাত্তরের শোকাবহতাকে। সৈয়দ আজিজুল হক এ চিত্র প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখাবয়বের বাইরের ওইসব চোখ একটি বার্তাই বহন করে, তা হলো: চোখ থেকে অশ্রুপাতের বিষয়টিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে।' (২০১৩: ৬৪) রং-রেখার সুনিপুণ ব্যবহারে চিত্রটি হয়ে উঠেছে সার্থক।

শিল্পী সফিউদ্দীনের কাজে সম্মিলন ঘটেছে গভীর সাধনা ও মননশীলতার, করণকৌশলগত নিপুণতা ও নান্দনিকতার। নিরন্তর নিরীক্ষাপ্রবণ সফিউদ্দীনের নিজের ভাষায় – 'আমি বারবার ফেইলিওর হয়েছি। আর যখনই ফেইলিওর হই তখনই আমার জিদ বেড়ে যায় – আবার চেষ্টা করি, কিছু কিছু এগিয়ে যাই। আমি সেই কাজ করতে চাই, যাতে আমি থাকবো – যাতে আমার দেশ থাকবে।' (সফিউদ্দীন, ১৯৯৮: ২৫৫) শিল্পীর মনোবাসনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর শিল্পকর্মসমূহে। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের মাঝেই বেঁচে থাকবেন দীর্ঘকাল।

সফিউদ্দীন আহমেদ-এর উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্র

চিত্রঃ ০১। 'কৃষকের মুখ', ১৯৪২

চিত্রঃ ০২। 'ঘরে ফেরা' বা 'বাড়ির পথে', ১৯৪৪

চিত্রঃ ০৩। 'সাঁওতাল রমণী', ১৯৪৬

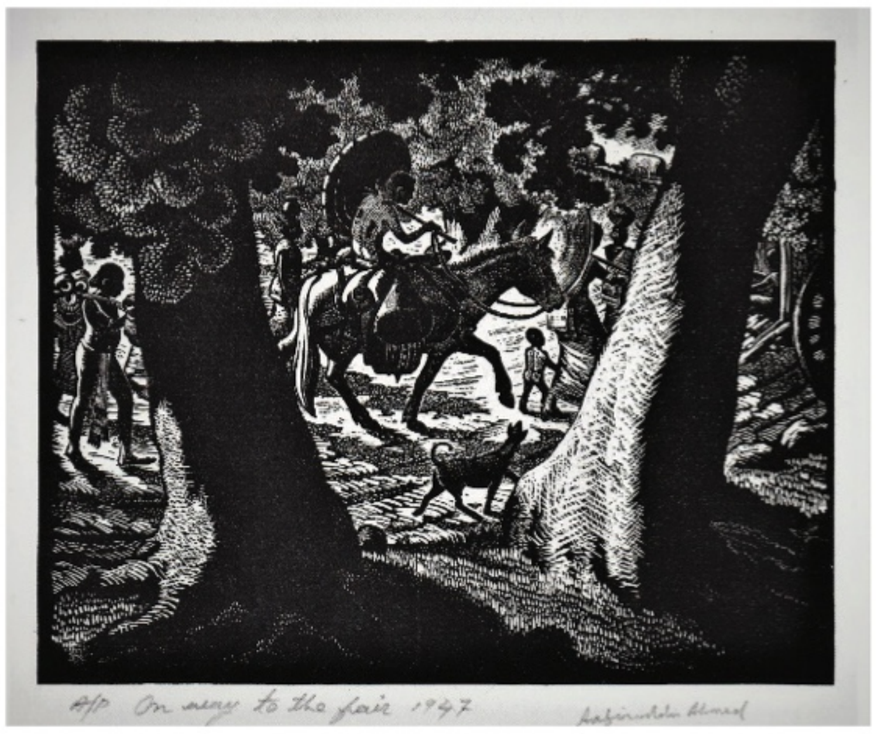

চিত্রঃ ০৪। 'মেলার পথে', ১৯৪৭

চিত্রঃ ০৫। 'গুনটানা', ১৯৫৫

চিত্রঃ ০৬। 'বন্যা', ১৯৫৬

চিত্রঃ ০৭। 'শালবন ও মহিষ', ১৯৪৪

চিত্রঃ ০৮। 'ময়ূরাক্ষী তীরে দুই নারী', ১৯৪৫

চিত্রঃ ০৯। 'শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট', ১৯৪৫

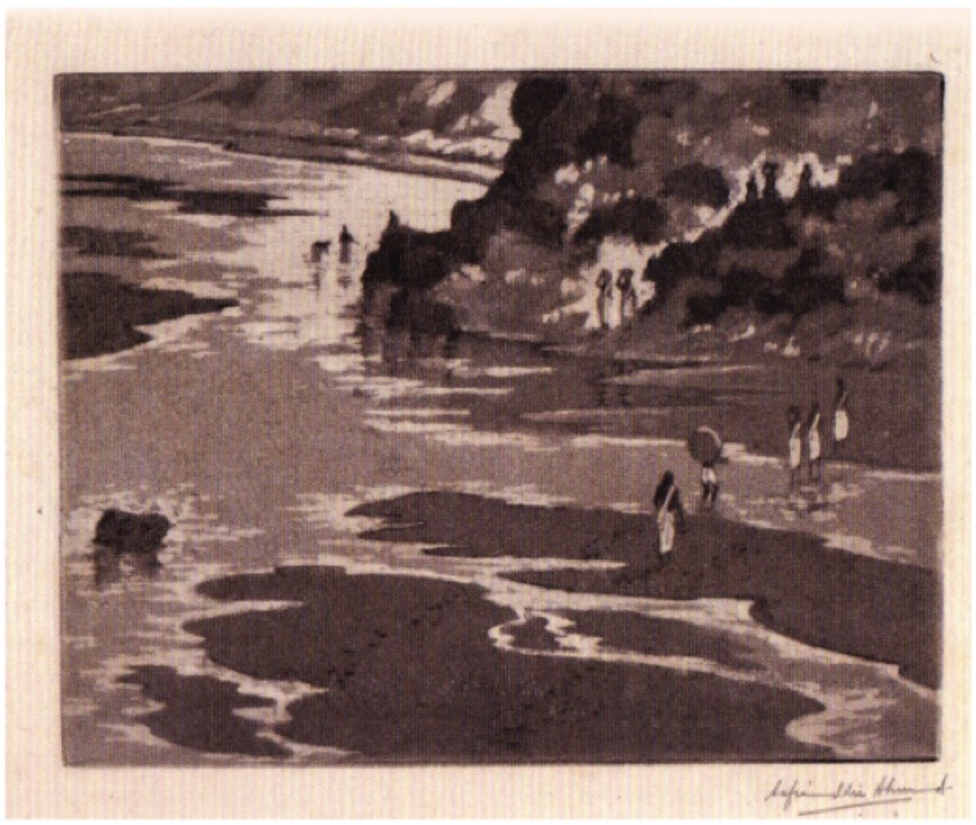

চিত্রঃ ১০। 'ময়ূরাক্ষী', ১৯৪৫

চিত্রঃ ১১। 'পারাবত', ১৯৪৫

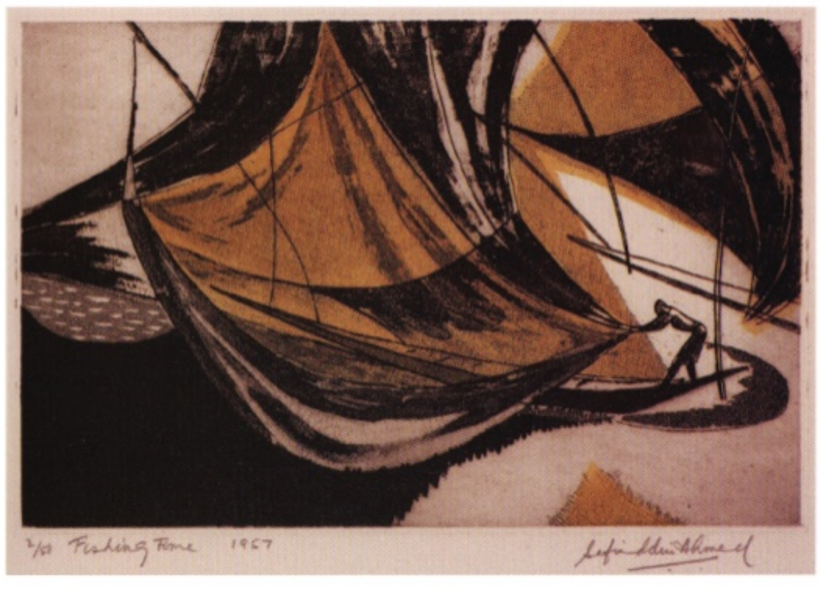

চিত্রঃ ১২। 'মাছ ধরার সময়', ১৯৫৭

চিত্রঃ ১৩। ‘নেমে যাওয়া বান’, ১৯৫৯

চিত্রঃ ১৪। ‘সেতু পারাপার’, ১৯৫৯

চিত্রঃ ১৫। ‘মাছ ধরার সময়-১’, ১৯৬২

চিত্রঃ ১৬। ‘বিক্ষুব্ধ মাছ’, ১৯৬৪

চিত্রঃ ১৭। ‘জলের নিনাদ’, ১৯৮৫

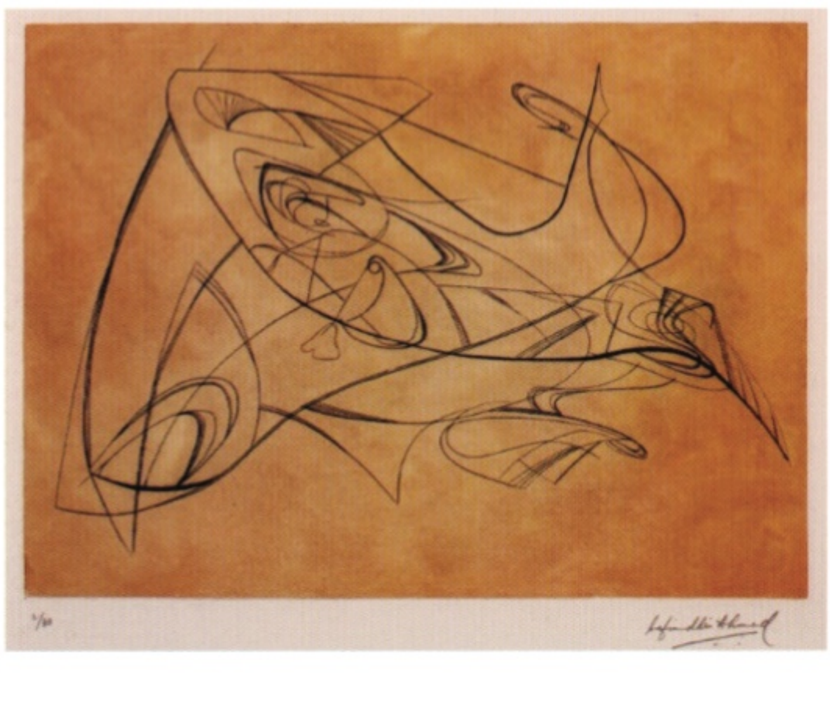

চিত্রঃ ১৮। ‘জেলের স্বপ্ন’, ১৯৫৭

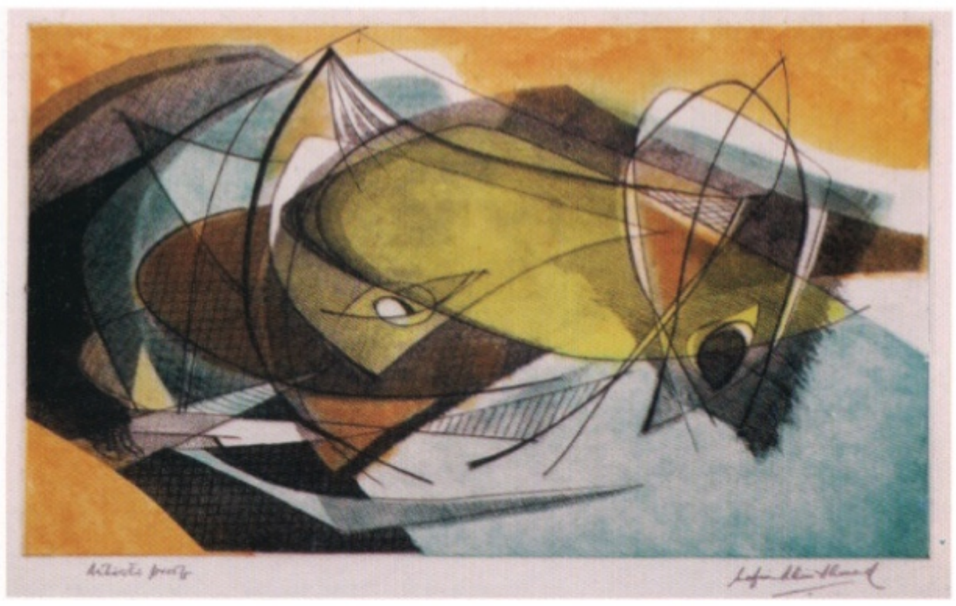

চিত্র: ১৯। 'হলুদ জাল', ১৯৫৭

চিত্র: ২০। 'গুণটানা', ১৯৫৮

চিত্র: ২১। 'কান্না', ১৯৮০

চিত্র: ২২। 'একুশে স্মরণে', ১৯৮৭

চিত্র: ২৩। 'একাত্তরের স্মৃতি', ১৯৮৮

চিত্র: ২৪। 'একাত্তরের স্মরণে', ২০০২

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

ক. গ্রন্থ

আবুল মনসুর, ২০১৬। *শিল্পকথা ও শিল্পীকথা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

কমল আইচ, ২০০৯। *শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ১৯৭৪। *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রফিকুন নবী, ২০১৬। *দেশসেরা জগৎসেরা শিল্পীকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

শোভন সোম, ২০১৬। *বাংলার ছাপচিত্রকলা ১৮১৬-১৯৪৭*, সহজপাঠ ও যাপন, কলকাতা ।

শামসুজ্জামান খান, ২০১৩। *বাংলাদেশের উৎসব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

শরীফ আতিক-উজ-জামান, ২০০৬। *দশ পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী* সূচীপত্র, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৩। *সফিউদ্দীন আহমেদ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

Elizabeth, (*et al.*), 1994. *Themes and Foundation of Art*, National Textbook Company, U.S.A.

Ian Chilvers (edt.), 2012. *The Oxford Dictionary of Art and Artists*, Oxford University Press, UK.

Syed Azizul Haque 2011. 'A pilgrim's quest for art', Rosa Maria Falvo (edt.), *Safiuddin Ahmed*, Skira, Italy; Bengal Foundation, Dhaka.

খ. প্রবন্ধ

আব্দুল মতিন সরকার, ২০০২। 'তাঁর ছবিতে চোখ', আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কালি ও কলম*, (সফিউদ্দীন আহমেদ সংখ্যা) ৯ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা।

আবুল বারক আল্ভী, ২০১২। 'শিল্পকলার সাধক : শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমদ', আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *শিল্প ও শিল্পী*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মাহমুদ আল জামান, ২০০২। 'পরিপূর্ণ এক শিল্পী মানুষ', আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *সফিউদ্দিন আহমদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

রফিকুন নবী, ২০০২। 'শিল্পের অনন্য সাধক', আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কালি ও কলম*, (সফিউদ্দীন আহমেদ সংখ্যা) ৯ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা।

শোভন সোম, ২০০৭। 'সফিউদ্দিন আহমেদ', লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সফিউদ্দীন আহমেদ, ১৯৯৮। 'নিজের কথা', মতলুব আলী সম্পাদিত, *রূপবন্ধ*, মানব প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০০২। 'শুদ্ধতার সাধক', আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কালি ও কলম*, (সফিউদ্দীন আহমেদ সংখ্যা) ৯ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা।

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

Basupurna Mukherjee, "Woodcut Prints of Bengal : Nineteenth and Twentieth Century" (Unpublished Phd Thesis), University of Calcutta : Department of History, 2011 (Pdf. copy)